بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল-খামেস (আই.)-এর ১৩ মার্চ, ২০২৬ মোতাবেক ১৩ আমান, ১৪০৫ হিজরী শামসীর জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

মহানবী (সা.)-এর জীবনচরিতের আলোকে আমি দুই জুমুআ পূর্বে তাঁর আচরিত জীবনের একটি দিক (তথা) তওহীদের জন্য (তাঁর) ব্যাকুলতার কথা উল্লেখ করেছিলাম। এটি এমন এক উদ্দেশ্য ছিল যা প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং এর জন্য কেবল তাঁর নিজের কথা ও কাজেই ব্যাকুলতা প্রকাশ পায় না, বরং তিনি তাঁর সাহাবীদের মাঝে, নিজের অনুসারীদের মাঝেও তওহীদের খাতিরে সকল প্রকার ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত থাকার এমন চেতনা সৃষ্টি করেছিলেন যার কোনো তুলনা হয় না। আজও আমি তাঁর (সা.) জীবনচরিতের এই দিক সম্পর্কেই আলোচনা করব এবং এ প্রসঙ্গে কোনো কোনো সাহাবীর কুরবানী বা আত্মত্যাগের কথাও আসবে। তাঁর (সা.) ব্যবহারিক আদর্শ, ব্যাকুলতা এবং দোয়ার ফলেই সাহাবীরাও এমন মানে উপনীত হয়েছিলেন (যে পর্যায়ে) তারা সকল প্রকার ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত হয়ে যান। তওহীদ প্রতিষ্ঠার জন্য মহানবী (সা.)-এর কষ্ট সহ্য করার ঘটনার একটি রেওয়ায়েতে এভাবে উল্লেখ পাওয়া যায়:

একবার মুশরিক বা পৌত্তলিকরা মহানবী (সা.)-কে বলে, তুমি কি আমাদের উপাস্যদের সম্পর্কে অমুক কথা বলো না? তিনি (সা.) বলেন, হ্যাঁ। এরপর তারা তাঁর চতুর্দিকে জড়ো হয়ে যায়। তখন কেউ হযরত আবু বকর (রা.)-কে বলে, তোমার বন্ধু বিপদে পড়েছে, তার খবর নাও। হযরত আবু বকর (রা.) রওয়ানা হয়ে মসজিদে হারামে গিয়ে পৌঁছেন। তিনি মহানবী (সা.)-কে লোকপরিবেষ্টিত অবস্থায় দেখতে পান। হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, তোমাদের মন্দ হোক! এরপর, যেমনটি পবিত্র কুরআনে আছে, তিনি বলেন:

أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللّٰهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنٰتِ مِنْ رَبِّكُمْ (সূরা আল-মু'মিন:২৯)

"তোমরা কি এক ব্যক্তিকে কেবল 'আল্লাহ্ আমার প্রতিপালক' বলার কারণে হত্যা করতে চাও, অথচ সে তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে এসেছে?" তখন তারা মহানবী (সা.)-কে ছেড়ে দেয় এবং হযরত আবু বকর (রা.)-র ওপর হামলে পড়ে এবং তাঁকে মারধোর করা আরম্ভ করে। হযরত আবু বকর (রা.)-র কন্যা হযরত আসমা (রা.) বলেন, তিনি আমাদের কাছে এমন অবস্থায় আসেন যে, তিনি নিজের চুলে হাত দিলে তা তাঁর হাতে চলে আসছিল। এত জোরে চুল ধরে টেনেছিল যে, তা গোড়া থেকে উপড়ে গিয়েছিল। তখন হযরত আবু বকর (রা.) একথা বলছিলেন, تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ – **হে প্রতাপ ও মর্যাদার অধিকারী খোদা! তুমি কল্যাণময়**। একটি রেওয়ায়েত অনুসারে, ওই লোকেরা মহানবী (সা.)-এর পবিত্র চুল ও পবিত্র দাড়ি ধরে এত জোরে টান দেয় যে, তাঁর অধিকাংশ চুল উপড়ে যায়। তখন হযরত আবু বকর (রা.) তাঁকে রক্ষা করার জন্য দণ্ডায়মান হন এবং তিনি বলছিলেন, أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللّٰهُ **"তোমরা কি কেবল এই কারণে এক ব্যক্তিকে হত্যা করবে যে, সে বলে, 'আমার প্রতিপালক হলেন**

আল্লাহ্'?" (সূরা আল-মু'মিন:২৯) আর আবু বকর (রা.) কাঁদছিলেনও। তখন মহানবী (সা.) বলেন, হে আবু বকর! এদের ছেড়ে দাও। সেই সত্তার শপথ যাঁর হাতে আমার প্রাণ! আমি তাদের কাছে প্রেরিত হয়েছি তাদের খাতিরে উৎসর্গিত হবার জন্য। এরপর তারা মহানবী (সা.)-কে ছেড়ে দেয়। *অর্থাৎ, যখন তারা মহানবী (সা.)-এর ওপর অত্যাচার করছিল, মারধোর করছিল, সে সময় আবু বকর (রা.) মাঝে বাদ সাধেন তখন মহানবী (সা.) তাকে বলেন, তুমি এদের ছেড়ে দাও।*

একইভাবে একজন বর্ণনাকারী হারেস বিন হারেস গামিদী (রা.) কুরাইশকে মহানবী (সা.)-এর ওপর নিপীড়ন করতে দেখেন, তখন তিনি তাঁর পিতাকে জিজ্ঞেস করেন, এরা কারা? *শুধু একটি ঘটনা নয়, এ ধরনের অসংখ্য ঘটনা ঘটেছে। এগুলো সাদৃশ্যপূর্ণ ঘটনা। আর বহু মানুষ তা দেখেছেন এবং অনেকে রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন; বিভিন্ন বর্ণনাকারী রয়েছেন। কোনোটির বিস্তারিত বিবরণ আছে, আবার কোনোটির সংক্ষিপ্ত।* যাহোক, যখন তিনি দেখেন এবং তাঁর পিতাকে জিজ্ঞেস করেন, এরা কারা যারা অত্যাচার করছে? সে বলে, এই লোকেরা তাদের সাবী-র (বা ধর্মত্যাগকারীর) চতুর্দিকে জড়ো হয়েছে। মক্কাবাসীরা মহানবী (সা.) এবং মুসলমানদেরকে ব্যঙ্গ করে 'সাবী' বলত। বর্ণনাকারী বলেন, আমরাও বাহন থেকে নামি এবং দেখি, মহানবী (সা.) মানুষজনকে মহামহিমান্বিত আল্লাহ্‌র তওহীদ এবং এর প্রতি ঈমান আনয়নের জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন, আর তারা তাঁকে অস্বীকার করছিল এবং তাঁকে কষ্ট দিচ্ছিল। এমনকি এক পর্যায়ে দুপুর নেমে আসলে লোকেরা তাঁর চতুর্দিক থেকে সরে যায়।

তাঁর (সা.) ওপর নির্যাতনের কথা ইতিহাসের বিভিন্ন গ্রন্থে বিদ্যমান, সেগুলো থেকে নিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-ও বর্ণনা করেছেন। 'দীবাচা তফসীরুল কুরআন'-এর এক স্থানে তিনি লিখেছেন:

একবার তিনি (সা.) বাজার অতিক্রম করছিলেন, তখন মক্কার একদল বখাটে তাঁর চতুর্দিকে জড়ো হয়ে যায় এবং পুরো রাস্তায় তাঁর ঘাড়ে একথা বলে চড় মারতে থাকে যে, হে লোকসকল! এই হলো সেই ব্যক্তি যে বলে, 'আমি একজন নবী'। তাঁর বাড়িতে চারপাশের বাড়িঘর থেকে ক্রমাগত পাথর নিক্ষেপ করা হতো। তাঁর বাড়িতে নোংরা আবর্জনা ফেলা হতো। রান্না করার জায়গাতেও নোংরা জিনিস ফেলা হতো, যার মধ্যে ছাগল ও উটের নাড়িভুঁড়ি ইত্যাদিও থাকত। তিনি যখন নামায পড়তেন তখন তাঁর ওপর ধুলোবালি ও মাটি নিক্ষেপ করা হতো, মাটি ফেলা হতো; এমনকি বাধ্য হয়ে তাঁকে পাহাড় থেকে বেরিয়ে থাকা একটি পাথরের নীচে লুকিয়ে নামায পড়তে হতো। কিন্তু সহস্র সহস্র দরূদ বর্ষিত হোক তাঁর (সা.) পবিত্র ও আশিসময় সত্তার প্রতি! তওহীদ প্রতিষ্ঠার জন্য যে ব্যাকুলতা তাঁর বক্ষে তরঙ্গায়িত ছিল তা কখনো এক মুহূর্তের জন্যও কমে নি, আর এসব কষ্টকে তিনি অত্যন্ত প্রফুল্লচিত্তে ও পরম আনন্দের সাথে বরণ করে নিয়েছিলেন। তদুপরি মানবজাতির প্রতি তাঁর স্নেহ ও ভালোবাসায় এতটুকুও চিড় ধরে নি।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) আরও লিখেছেন, আমরা যখন মহানবী (সা.)-এর জীবনের ঘটনাবলির প্রতি লক্ষ্য করি, তখন এই দাবিটি আমাদের কাছে এক বাস্তব সত্য হিসেবে ধরা দেয় এবং আমরা প্রতিটি পদক্ষেপে এমন ঘটনা দেখতে পাই, যা মানবজাতির প্রতি তাঁর সেই মহান ভালোবাসা ও স্নেহের প্রমাণ বহন করে। কাজেই, এক-অদ্বিতীয় খোদার বাণী পৌঁছে দেবার জন্য তাঁকে বছরের পর বছর এমন সব কষ্ট সইতে হয়েছে, যার কোনো সীমা নেই। একবার কা'বাগৃহে কাফিররা তাঁর গলায় কাপড় পেঁচিয়ে এত জোরে

টান দেয় যে, তাঁর চোখ বেরিয়ে আসার উপক্রম হয়। হযরত আবু বকর (রা.) শুনতে পেয়ে ছুটে যান এবং মহানবী (সা.)-কে এমন কষ্টদায়ক অবস্থায় দেখতে পেয়ে তাঁর চোখ অশ্রুসজল হয়ে যায় এবং তিনি সেই কাফিরদের সরিয়ে দিয়ে বলেন, খোদাকে ভয় করো! তোমরা কি এক ব্যক্তিকে কেবল এ কারণে নির্যাতন করছ যে, তিনি বলেন– খোদা আমার প্রতিপালক-প্রভু?

একবার মহানবী (সা.) মসজিদে হারামে দাঁড়িয়ে মক্কার পৌত্তলিকদের সম্বোধন করে বলেন, **তোমরা বলো,** لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ অর্থাৎ, **আল্লাহ্ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই; যদি তোমরা এটি বলো তাহলে সফলকাম হবে।** একথা শুনে কুরাইশ তাঁর (সা.) ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। একজন ব্যক্তি উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করতে করতে তাঁর ওপর আক্রমণ করতে উদ্যত হয়। তখন হারেস বিন আবী হালা (রা.) সবার আগে তাঁর (সা.) কাছে পৌঁছে যান। তিনি অর্থাৎ হারেস সেই লোকদের সাথে লড়াই শুরু করেন এবং তাদেরকে মহানবী (সা.)-এর কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দেন। এরপর তারা সবাই তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, এমনকি তাকে অর্থাৎ হারেস (রা.)-কে শহীদ করে দেয়।

তওহীদ প্রচারের অপরাধের শাস্তিস্বরূপ মক্কার কাফিররা তিন বছর পর্যন্ত তাঁকে (সা.) এবং তাঁর পরিবারের সদস্যদেরকে শে'বে আবী তালিবে এমনভাবে বন্দি করে রেখেছিল যে, সব ধরনের সামাজিক বয়কটের সম্মুখীন করা হয়। যখন এই বয়কট শেষ হয়, তখন একদিকে মহানবী (সা.) সারা মক্কায় পূর্বের চেয়েও দৃঢ় সংকল্প নিয়ে ও সাহসিকতার সাথে তওহীদের প্রচার পুনরায় ব্যাপকভাবে আরম্ভ করেন, অন্যদিকে কুরাইশ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর ওপর পুনরায় অত্যাচার-নির্যাতন শুরু করে দেয়।

তাঁর (সা.) তায়েফ সফরের বিখ্যাত ঘটনাটিও রয়েছে, যা এর আগেও কয়েকবার বর্ণিত হয়েছে। সেখানে তাঁর ওপর যে নির্যাতন হয়েছিল, তা-ও ইতিহাসে বিভিন্নভাবে বর্ণিত হয়েছে। একই প্রসঙ্গে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.)-ও এক জায়গায় লিখেছেন। এক স্থানে তিনি এই ঘটনাটি এভাবে বর্ণনা করেছেন:

যখন শে'বে আবী তালিবের অবরোধ তুলে নেওয়া হয় এবং মহানবী (সা.) নিজের চলাফেরায় এক প্রকার স্বাধীনতা লাভ করেন, তখন তিনি তায়েফে গিয়ে সেখানকার লোকদের ইসলামের প্রতি আহ্বান জানানোর সিদ্ধান্ত নেন। *এটি আগেও বর্ণিত হয়েছে, তবে এখানে বিবরণ কিছুটা বিস্তারিত ও ভিন্নরূপে এসেছে।* তায়েফ একটি বিখ্যাত স্থান, যা মক্কার দক্ষিণ-পূর্বে চল্লিশ মাইল দূরে অবস্থিত এবং সেখানে বনু সাকীফ গোত্র বসবাস করত। কা'বার বিশেষত্বকে পৃথক রেখে বলা যায়, তায়েফ মক্কার সমকক্ষ ছিল এবং সেখানে বড়ো বড়ো বিত্তবান, প্রভাবশালী ও ধনী লোকেরা বসবাস করত। আর তায়েফের এই গুরুত্বের কথা স্বয়ং মক্কাবাসীরাও স্বীকার করত। বস্তুত এটি মক্কাবাসীদেরই উক্তি যা পবিত্র কুরআনে সংরক্ষিত আছে যে,

وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَٰذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ (সূরা আয-যুখরুফ:৩২)

অর্থাৎ, যদি এই কুরআন খোদার পক্ষ থেকেই হয়, তবে তা মক্কা বা তায়েফের কোনো বড়ো মানুষের ওপর কেন অবতীর্ণ করা হলো না?

মোটকথা, নবুওয়তের দশম বর্ষের শাওয়াল মাসে মহানবী (সা.) একাই তায়েফে গমন করেন। কোনো কোনো রেওয়ায়েত অনুযায়ী যায়েদ বিন হারেসা (রা.)-ও সাথে ছিলেন। সেখানে পৌঁছে তিনি (সা.) দশ দিন অবস্থান করেন এবং শহরের অনেক গণ্যমান্য

ব্যক্তির সাথে একের পর এক সাক্ষাৎ করেন। কিন্তু সেই শহরের ভাগ্যেও মক্কার মতো সেসময় ঈমান আনা নির্ধারিত ছিল না, তাই সবাই অস্বীকার করে, বরং ঠাট্টাবিদ্রুপ করে। পরিশেষে তিনি তায়েফের প্রধান নেতা আবদে ইয়ালীলের কাছে গিয়ে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানান, কিন্তু সে-ও পরিষ্কারভাবে অস্বীকার করে; বরং উপহাসের সুরে বলে, **আপনি যদি সত্যবাদী হয়ে থাকেন তবে আপনার সাথে কথা বলার আমার সাহস নেই, আর যদি মিথ্যাবাদী হন তবে কথা বলাই অর্থহীন**। সে মহানবী (সা.)-কে এই উত্তর দিয়েছিল।

এরপর এই ভেবে যে, শহরের যুবকদের ওপর পাছে তাঁর (সা.) কথার প্রভাব পড়ে যায়– সে তাঁকে বলে, **আপনার এখান থেকে চলে যাওয়াই ভালো হবে, কারণ এখানে কেউ আপনার কথা শোনার জন্য প্রস্তুত নয়**। এরপর এই হতভাগা শহরের বখাটে লোকদের তাঁর (সা.) পেছনে লেলিয়ে দেয়। মহানবী (সা.) যখন শহর থেকে বের হন তখন এই লোকেরা চেঁচামেচি করতে করতে তাঁর পিছু ধাওয়া করে এবং তাঁর ওপর পাথর ছুঁড়তে থাকে, যার ফলে তাঁর সারা শরীর রক্তে রঞ্জিত হয়ে যায়। একাধারে তিন মাইল পর্যন্ত এই লোকগুলো তাঁর সাথে সাথে গালিগালাজ করতে করতে এবং পাথর ছুঁড়তে ছুঁড়তে আসতে থাকে।

তায়েফ থেকে তিন মাইল দূরে মক্কার নেতা উতবা বিন রবীআর একটি বাগান ছিল। মহানবী (সা.) সেখানে এসে আশ্রয় নেন এবং অত্যাচারীরা ক্লান্ত হয়ে ফিরে যায়। এখানে একটি ছায়ায় দাঁড়িয়ে তিনি আল্লাহ্‌র দরবারে এভাবে দোয়া করেন:

اللهمَّ إليك أشكو ضَعْفَ قوَّتي، وقِلَّةَ حيلتي، وهواني على الناسِ، يا أرحَمَ الراحِمِينَ، أنت ربُّ المستضعَفِينَ، وأنت ربِّي

অর্থাৎ, হে আমার প্রতিপালক প্রভু! আমি আমার শক্তিহীনতা, উপকরণের স্বল্পতা এবং মানুষের সামনে আমার অসহায়ত্বের অভিযোগ কেবল তোমার কাছেই করছি। হে আমার খোদা! তুমি সবচেয়ে বেশি দয়ালু এবং দুর্বল ও অসহায়দের তুমিই অভিভাবক ও রক্ষক, আর তুমিই আমার প্রতিপালক।

এরপর যা বলেছেন সে অংশের অনুবাদ হলো, আমি তোমার জ্যোতির্ময় চেহারার আশ্রয়ে আসছি, কেননা তুমিই অন্ধকারকে দূরীভূত করো এবং মানুষকে ইহ ও পরকালের কল্যাণরাজির উত্তরাধিকারী বানাও।

উতবা ও শায়বা তখন তাদের সেই বাগানে উপস্থিত ছিল; তারা যখন তাঁকে (সা.) এই অবস্থায় দেখে তখন দূরের বা কাছের আত্মীয়তা অথবা স্বজাতি-বাৎসল্য কিংবা কে জানে কী কারণে আদ্দাস নামক তাদের এক খ্রিষ্টান দাসের হাতে একটি পাত্রে কিছু আঙুর দিয়ে তাঁর কাছে পাঠায়। তিনি (সা.) তা গ্রহণ করেন এবং আদ্দাসকে সম্বোধন করে বলেন, তুমি কোথাকার অধিবাসী এবং কোন ধর্মের অনুসারী? সে বলে, আমি নিনেভার অধিবাসী এবং ধর্মমতে খ্রিষ্টান। মহানবী (সা.) বলেন, **এ কি সেই নিনেভা, যা খোদার পুণ্যবান বান্দা ইউনুস বিন মাত্তার আবাসস্থল ছিল?** আদ্দাস বলে, হ্যাঁ, কিন্তু আপনি ইউনুসের কথা কীভাবে জানলেন? তিনি (সা.) বলেন, **তিনি আমার ভাই ছিলেন, কারণ তিনিও আল্লাহ্‌র নবী ছিলেন এবং আমিও আল্লাহ্‌র নবী**। এরপর তিনি তাকে ইসলামের প্রতি আহ্বান জানান, যেটির তার ওপর গভীর প্রভাব পড়ে এবং সে এগিয়ে এসে আন্তরিক আবেগে মহানবী (সা.)-এর হাত চুম্বন করে।

দূরে দাঁড়িয়ে উতবা এবং শায়বাও এই দৃশ্য দেখতে পেয়েছিল। তাই আদ্দাস যখন তাদের কাছে ফিরে আসে তখন তারা বলে, আদ্দাস! তোর কী হয়েছিল যে, এই ব্যক্তির হাত চুম্বন করছিলি? এই ব্যক্তি তো তোর ধর্ম নষ্ট করবে, অথচ তোর ধর্ম তার ধর্মের চেয়ে উত্তম।

মহানবী (সা.) কিছুক্ষণ সেই বাগানে বিশ্রাম নেন এবং এরপর সেখান থেকে যাত্রা করে নাখলায় পৌঁছেন, যা মক্কা থেকে এক মনযিল দূরে অবস্থিত। সেখানে তিনি কয়েকদিন অবস্থান করেন। এরপর নাখলা থেকে রওয়ানা হয়ে তিনি হেরা পর্বতে আসেন। যেহেতু তায়েফ সফরের বাহ্যিক ব্যর্থতার কারণে মক্কাবাসীদের আরও বেশি ধৃষ্ট হয়ে ওঠার আশঙ্কা ছিল এবং মনে হচ্ছিল, এর ফলে তারা আরও বেশি নির্যাতন করবে, তাই এখান থেকে তিনি (সা.) মৌখিকভাবে কোনো এক ব্যক্তির মাধ্যমে মুতইম বিন আদীর কাছে বলে পাঠান, **আমি মক্কায় প্রবেশ করতে চাই, তুমি কি এই কাজে আমাকে সাহায্য করতে পারো?**

মুতইম ঘোর কাফির ছিল, কিন্তু প্রকৃতিগতভাবে সে ভদ্র ছিল; আর এমন পরিস্থিতিতে অস্বীকার করা আরবের ভদ্রলোকদের স্বভাববিরুদ্ধ ছিল। তাই সে তার পুত্রদের এবং আত্মীয়স্বজনদের সাথে নেয় এবং সবাই সশস্ত্র হয়ে কা'বার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে যায় এবং তাঁকে (সা.) বলে পাঠায়, চলে আসুন। তিনি (সা.) আসেন এবং কা'বা তওয়াফ করেন এবং সেখান থেকে মুতইম ও তার সন্তানদের সাথে তরবারির ছায়ায় নিজ গৃহে প্রবেশ করেন। রাস্তায় আবু জাহল মুতইমকে এই অবস্থায় দেখে অবাক হয়ে বলে, أَمُجِيرٌ أَمْ تَابِعٌ؟– অর্থাৎ, তুমি কি মুহাম্মদকে শুধু আশ্রয় দিয়েছ নাকি তার অনুসারী হয়ে গেছ? মুতইম বলে, আমি শুধু আশ্রয়দাতা, অনুসারী নই। এতে আবু জাহল বলে, আচ্ছা, তাহলে কোনো সমস্যা নেই। মুতইম অবশ্য কাফির হিসেবেই মারা যায়। তবে সে এই পুণ্যের কাজটি করেছিল।

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, একবার হযরত আয়েশা (রা.) মহানবী (সা.)-এর কাছে জানতে চান, আপনার জীবনে কি কখনো উহুদের যুদ্ধের দিনের চেয়েও বেশি কষ্টের দিন এসেছে? তিনি (সা.) বলেন, **হে আয়েশা! তোমার সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে আমাকে অনেক বড়ো বড়ো কঠিন মুহূর্তের সম্মুখীন হতে হয়েছে।** এরপর তিনি তায়েফ সফরের ঘটনাবলি বিবৃত করেন এবং বলেন, এই সফর থেকে ফেরার পথে আমার কাছে পাহাড়ের ফেরেশতা আসেন এবং বলেন, খোদা আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন যেন নির্দেশ পেলে আমি এই ডান ও বামের উভয় পাহাড় এই লোকদের ওপর চাপিয়ে দিই, অর্থাৎ তাদের ওপর ফেলে দিই এবং তাদেরকে ধ্বংস করে দিই। তিনি (সা.) বলেন, **না, কখনো না। আমি আশা রাখি, আল্লাহ্ তা'লা তাদের মাঝে এমন লোক সৃষ্টি করবেন যারা এক আল্লাহ্‌র ইবাদত করবে।** লোকদের জন্য সহানুভূতি প্রাধান্য লাভ করে এবং একই সাথে এই বিষয়টির প্রতিও দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, একদিন তাদের বংশধরেরা ইসলাম গ্রহণ করবে এবং তওহীদের ওপর প্রতিষ্ঠিত হবে।

তাঁর (সা.) তওহীদের জন্য কঠোরতা সহ্য করার ঘটনাবলি একস্থানে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এভাবে বর্ণনা করেছেন:

শত্রুদের পক্ষ থেকে তাঁকে সকল কষ্ট তওহীদ প্রচার করার কারণে দেওয়া হয়েছে। তাঁকে প্রহার করা হতো, কুকুর এবং বখাটে ছেলেদের তাঁর পেছনে লেলিয়ে দেওয়া হতো।

একবার তিনি তায়েফ গেলে সেখানে লোকেরা এত প্রহার করে যে, তিনি আপাদমস্তক রক্তরঞ্জিত হয়ে যান। *এর বিস্তারিত আমি এখনই বর্ণনা করলাম।* তিনি কষ্টের কারণে পড়ে যেতেন, কিন্তু যখন উঠতেন তখন তারা আবার তাঁর (সা.) ওপর পাথর নিক্ষেপ করত। এমন অবস্থাতেও তাঁর পবিত্র মুখ থেকে একথাই বের হতো, **হে খোদা! তাদেরকে ক্ষমা করে দাও, কেননা তারা প্রকৃত বিষয় সম্পর্কে অজ্ঞ।** এমন সকল পরিস্থিতির মুখোমুখি হওয়া সত্ত্বেও তিনি (সা.) তওহীদের প্রচার পরিত্যাগ করেন নি। বারংবার একথাই বলেন যে, এরা যা-ই করুক না কেন, আমি তওহীদের প্রচার পরিত্যাগ করব না। যখন তাঁর মৃত্যুর সময় সন্নিকটবর্তী হলো তখনও তিনি একথা বলেই মৃত্যুবরণ করেন, **আমার বিদায়ের পর শিরক কোরো না;** অর্থাৎ, সারা জীবন তিনি (সা.) তওহীদের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

তিনি (রা.) লেখেন, আমি মনে করি, রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর জন্মের পূর্বে পিতার মৃত্যু এবং জন্মের পর সত্বর মায়ের মৃত্যুর মাধ্যমে খোদা তা'লা তওহীদের প্রমাণ দিয়েছেন। তাঁর পিতা-মাতার মৃত্যুর মাধ্যমে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ তা'লার উদ্দেশ্য ছিল নিজের তওহীদের প্রমাণ দেওয়া। তাঁর অসহায় হওয়া, পিতা-মাতা কেউ না থাকা আর সুমহান পরিণাম– এগুলো নিজগুণে খোদা তা'লার তওহীদের বড়ো প্রমাণ। এর মাধ্যমে প্রমাণ হয় যে, আল্লাহ্ তা'লা– যাঁর তওহীদের প্রচার তিনি (সা.) করতেন– তিনিই শৈশব থেকে শেষ পর্যন্ত তাঁর তত্ত্বাবধান করেছেন।

আরবের হাটে-বাজারেও তাঁর তবলীগের উল্লেখ পাওয়া যায়। লিখিত আছে, মহানবী (সা.) তওহীদ প্রতিষ্ঠার জন্য মক্কায় ব্যক্তিগত ও দলগত তবলীগের দায়িত্ব সম্পাদন করতেন। এছাড়া আরবের হাটে-বাজারেও চলে যেতেন এবং সেখানে এক-অদ্বিতীয় খোদার দিকে আসার আহ্বান জানাতেন। মক্কার বাহিরে বিভিন্ন স্থানে লোকজন একত্রিত হতো, ক্রয়-বিক্রয় হতো, জনসমাগম হতো; সেগুলোকে 'আসওয়াকুল আরাব' বা আরবের বাজার বলা হতো। ভারতীয় উপমহাদেশে যেটাকে মেলা বলা হয়, এমন মেলা বসতো। উক্কায, মুজান্না এবং যুল মাজায কুরাইশ এবং আরবদের বাজার ছিল। এগুলোর মাঝে উক্কায সবচেয়ে বড়ো বাজার ছিল যা মক্কা থেকে তিন রাতের দূরত্বে অবস্থিত ছিল। উক্কাযের বাজারে আরবরা পুরো শাওয়াল মাস অবস্থান করত। এরপর মুজান্নার বাজার বসতো যা মক্কা থেকে কয়েক মাইল দূরে মাররুয যাহরানে অবস্থিত ছিল। সেখানে ২০ যিলকদ পর্যন্ত অবস্থান করত। এরপর যুল মাজায বাজারের দিকে স্থানান্তরিত হতো যেটি আরাফাতের ময়দান থেকে তিন মাইল দূরে ছিল। সেখানে হজ্জের দিনগুলো পর্যন্ত অবস্থান করত। এ সমস্ত স্থানে মহানবী (সা.) গিয়ে তবলীগ করতেন। হযরত জাবের (রা.) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) মক্কায় দশ বছর পর্যন্ত অবস্থান করেন। হজ্জের দিনগুলোতে তিনি উক্কায ও মুজান্নার মেলাতে গিয়ে এবং লোকদের ঘরে ও তাদের অবস্থানস্থলে গিয়ে তাদেরকে তবলীগ করতেন। তিনি (সা.) বলতেন, **কে আছে যে আমাকে আশ্রয় দেবে? কে আছে যে আমাকে আমার প্রতিপালক-প্রভুর বার্তা পৌঁছাতে সাহায্য করবে আর এর ফলে সে জান্নাত লাভ করবে?**

হযরত রবীআ বিন ইবাদ (রা.) যিনি অজ্ঞতার যুগ পেয়েছেন আর পরবর্তীতে ইসলাম গ্রহণও করেছিলেন– তিনি বলেন, আমি যুল মাজাযের বাজারে স্বচক্ষে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে দেখেছি, তিনি (সা.) লোকদেরকে বলছিলেন, **হে লোকসকল! ঘোষণা দাও, আল্লাহ্ ভিন্ন কোনো উপাস্য নেই, তাহলে তোমরা সফলতা লাভ করবে।** তিনি (সা.)

বাজারের অলি-গলিতে হাঁটতেন আর লোকেরা তাঁকে লক্ষ্য করে চিৎকার-চেঁচামেচি করত। কিন্তু আমি তাঁকে (সা.) মান্য করতে হবে– একথা বলার মতো কাউকে দেখি নি। এরপরও মহানবী (সা.) বার্তা পৌঁছানো থেকে বিরত হতেন না এবং বার বার বলতেন, **হে লোকসকল! তোমরা ঘোষণা দাও, আল্লাহ্ ভিন্ন কোনো উপাস্য নেই, তোমরা সফলকাম হবে**। এই তওহীদের বার্তা প্রচারের কারণে আপন-পর উভয়ের পক্ষ থেকে তাঁকে (সা.) কষ্ট ভোগ করতে হয়েছে। প্রকাশ্যে ইবাদত পর্যন্ত করতে পারতেন না আর লোকদের পক্ষ থেকে আক্রমণের আশঙ্কা থাকত, কিন্তু সত্যের বাণী প্রচার করা থেকে তিনি বিরত হতেন না। যারাই মুসলমান হতেন তাদের ওপরও নির্যাতন চালানো হতো। যেমন, নামায আদায় ও ইবাদতের বিষয়ে একটি রেওয়ায়েত বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.) এবং হযরত আলী (রা.) মক্কার পাহাড়ের কোনো উপত্যকায় গিয়ে লোকচক্ষুর অন্তরালে নামায আদায় করতেন এবং বেশ কিছুদিন এভাবে চলতে থাকে। হযরত আবু তালিব এ বিষয়ে অবগত হয়ে তাদের দুইজনকে নামায পড়তে দেখে ফেলেন এবং মহানবী (সা.)-কে জিজ্ঞেস করেন, হে আমার ভাতিজা! এটা কেমন ধর্ম তুমি অবলম্বন করেছ? তিনি (সা.) বলেন, হে চাচা! এটি খোদা, তাঁর ফেরেশতাদের, তাঁর রসূলদের আর আমাদের পিতা ইবরাহীম (আ.)-এর ধর্ম। তিনি (সা.) আরও বলেন, খোদা আমাকে এই ধর্মসহ তাঁর বান্দাদের প্রতি রসূল হিসেবে প্রেরণ করেছেন। আর হে চাচা! আপনি এর সবচেয়ে বেশি হকদার যে, আমি আপনাকে নসীহত করি এবং আপনাকে হিদায়াতের পানে ডাকি; আর আপনি এটি গ্রহণ করার এবং আমাকে সাহায্য করার ক্ষেত্রে অবদান রাখার সবচেয়ে বেশি অধিকার রাখেন। হযরত আবু তালিব বলেন, হে আমার ভাতিজা! আমি আমার পূর্বপুরুষের ধর্মকে পরিত্যাগ করতে পারব না। কিন্তু যতদিন আমি জীবিত আছি, শত্রু তোমার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। যেভাবেই হোক আমি তোমাকে সাহায্য করব। হযরত আবু তালিব তার পুত্র আলী (রা.)-কেও জিজ্ঞেস করেন, তুমি এটি কোন ধর্ম গ্রহণ করেছ? উত্তরে তিনি (রা.) বলেন, আমি আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল (সা.)-এর প্রতি ঈমান এনেছি আর তিনি (সা.) যা নিয়ে এসেছেন আমি তার সত্যায়ন করেছি। আমি তাঁর (সা.) সাথে খোদার জন্য নামায আদায় করি। এরপর হযরত আবু তালিব বলেন, নিশ্চিতভাবে তিনি তোমাকে পুণ্যের প্রতিই আহ্বান করবেন, তাই তুমি (সর্বদা) তার সাথেই থেকো। *অর্থাৎ নিজের পুত্রকে বলেন, তাঁর (সা.) সাথেই থেকো।*

যেভাবে আমি বলেছি, তওহীদ গ্রহণ করার কারণে সাহাবীদের ওপরও ভীষণ অত্যাচার করা হয়েছে। একদিকে মক্কার কুরাইশ নিজেদের শক্তিমত্তা ও নেতৃত্বের কূটকৌশল প্রয়োগ করে কূটনৈতিক ও হুমকিমূলক কৌশলের মাধ্যমে মহানবী (সা.)-কে কোনো না কোনোভাবে ইসলাম প্রচার করা থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করেছিল। আর অপরদিকে তারা ইসলাম গ্রহণকারীদের ওপর চরম অত্যাচার ও নির্যাতন আরম্ভ করে দেয় এবং এমন হিংস্র আচরণ করে যা সম্পর্কে বিস্তারিত লেখার ভাষা নেই, আর তা বর্ণনা করার মতো সাহসও কারো হতে পারে না। এরপরও যতটুকু বর্ণিত হয়েছে তা এতটাই ভয়ঙ্কর যে মানুষেরকে কাঁপিয়ে তোলে।

হযরত বেলাল (রা.) রসূল (সা.)-এর প্রতি ঈমান আনার পর তাকে বিভিন্নভাবে নির্যাতন করা হতো। লোকেরা যখন হযরত বেলালকে (রা.) শাস্তি দেবার ক্ষেত্রে কঠোরতা প্রদর্শন করত তখন হযরত বেলাল (রা.) 'আহাদ, আহাদ' (আল্লাহ্ এক, আল্লাহ্ এক) ঘোষণা করতেন। সেই লোকেরা বলত, আমরা যেভাবে বলি তুমিও সেভাবে বলো। হযরত

বেলাল (রা.) উত্তরে বলতেন, তোমরা যা বলছ তা আমি ঠিকভাবে উচ্চারণ করতে পারি না। অন্য এক রেওয়ায়েতে রয়েছে, হযরত বেলাল (রা.)-র ওপর যখন অত্যাচার করা হতো এবং মুশরিকরা তাকে তাদের দিকে ফিরিয়ে নেবার চেষ্টা করত, তখন তিনি বলতেন, 'আল্লাহ্, আল্লাহ্'।

আরেক রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে, যখন হযরত বেলাল (রা.) ঈমান আনেন তখন তার মালিকেরা তাকে ধরে মাটিতে শুইয়ে দেয় এবং তার ওপর পাথর ও গরুর চামড়া চাপিয়ে দেয় এবং বলে, তোমার প্রভু তো লাত ও উযযা। কিন্তু তিনি বার বার বলতেন, 'আহাদ, আহাদ' (অর্থাৎ আল্লাহ্ এক, আল্লাহ্ এক)। এই অবস্থায় তার মালিকদের কাছে হযরত আবু বকর (রা.) এসে বলেন, তোমরা আর কতদিন এই মানুষটিকে কষ্ট দিতে থাকবে? এরপর হযরত আবু বকর (রা.) সাত উকিয়ার বিনিময়ে হযরত বেলাল (রা.)-কে কিনে মুক্ত করে দেন। এক উকিয়া ছিল চল্লিশ দিরহামের সমান; অর্থাৎ মোট দুইশ আশি দিরহামের বিনিময়ে তিনি তাকে কিনে মুক্ত করে দেন। এছাড়া হযরত সুমাইয়া, হযরত আম্মার বিন ইয়াসির, হযরত খাব্বাব এবং আরও অনেক দাস-দাসী ও স্বাধীন নারী-পুরুষ ছিলেন, যারা তওহীদের ওপর ঈমান আনার কারণে মক্কার কাফিরদের লজ্জাজনক ও যন্ত্রণাদায়ক নির্যাতনের শিকার হন। মক্কার কাফিররা দুর্বল মুসলমানদের ওপর তো অত্যাচার করতই, স্বয়ং রসূলে করীম (সা.)-এর পবিত্র সত্তাও তাদের অত্যাচার থেকে নিরাপদ ছিল না– যেমনটি আগে উল্লেখ করা হয়েছে। বরং যদি দেখা যায়, সবচেয়ে বেশি কষ্ট, দুঃখ ও নির্যাতনের সম্মুখীন হয়েছিলেন স্বয়ং মহানবী (সা.)। এটাও কম কষ্টের বিষয় ছিল না যে, যাঁর নাম ছিল 'মুহাম্মদ' (সা.)– অর্থাৎ সর্বাধিক প্রশংসিত– তাঁর নাম বিকৃত করে তাঁকে 'মুযাম্মাম' বলা হতো, যার অর্থ 'সর্বাধিক নিন্দিত' (নাউযুবিল্লাহ্)। যিনি সেই নগরীর সবচেয়ে সত্যবাদী মানুষ ছিলেন তাঁকে মিথ্যাবাদী ও প্রতারক বলা হতো। যিনি সেই জাতির সবচেয়ে বড়ো কল্যাণকামী ছিলেন তাঁকে ধোঁকাবাজ, লোভী ও প্রতারক বলা হতো। যিনি তাঁর যৌবন, শক্তি-স্বাস্থ্য এবং দিন-রাত সেই জাতির হিদায়াত, সংশোধন ও কল্যাণের জন্য উৎসর্গ করেছিলেন, তাঁকেই পাগল, উন্মাদ ও অসুস্থ বলা আরম্ভ হয়। কখনও তাঁর গলায় কাপড় পেঁচিয়ে এমনভাবে টানা হতো যে, তাঁর শ্বাস রুদ্ধ হবার উপক্রম হতো। কখনও তাঁর ওপর পাথর নিক্ষেপ করা হতো, আবার কখনও তাঁর ওপর ময়লা-আবর্জনা ফেলা হতো।

উরওয়া বিন যুবায়ের বর্ণনা করেন, আমি আবদুল্লাহ্ বিন আমর বিন আস (রা.)-কে জিজ্ঞেস করলাম, মুশরিকরা মহানবী (সা.)-এর সাথে সবচেয়ে নিকৃষ্ট যে আচরণটি প্রদর্শন করেছিল– আমাকে সেসম্পর্কে বলুন। তিনি বলেন, একবার মহানবী (সা.) মসজিদুল হারামের 'হাতীম'-এ দাঁড়িয়ে নামায পড়ছিলেন। কা'বা শরীফের পাশে যে খোলা জায়গাটির চারপাশে একটি ছোটো দেয়াল আছে, সেই অংশকে হাতীম বলা হয়। তখন উকবা বিন আবি মুয়ীত এসে মহানবী (সা.)-এর গলায় কাপড় পেঁচিয়ে হ্যাঁচকা টান দিয়ে শ্বাসরোধের চেষ্টা করে। এমন সময় হযরত আবু বকর (রা.) সেখানে পৌঁছে যান। তিনি এসে উকবার কাঁধ ধরে তাকে ধাক্কা দিয়ে মহানবী (সা.)-এর কাছ থেকে সরিয়ে দেন এবং বলেন, اَتَقْتُلُوْنَ رَجُلًا اَنْ يَّقُوْلَ رَبِّيَ اللّٰهُ অর্থাৎ **তোমরা কি কেবল এই কারণে এক ব্যক্তিকে হত্যা করবে যে, সে বলে, 'আমার প্রতিপালক হলেন আল্লাহ্'?** (সূরা আল-মু'মিন:২৯)

এরপর আমরা এটাও দেখতে পাই, পূর্বেও অনেকবার এটি বর্ণনা করা হয়েছে; যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি সবসময় তওহীদের জন্য গভীর আত্মাভিমান ও সাহসের পরিচয় দিয়েছেন। উহুদের যুদ্ধের একটি বিখ্যাত ঘটনা আমরা শুনে থাকি যে, যখন আবু সুফিয়ান রসূলুল্লাহ্ (সা.), হযরত আবু বকর (রা.) এবং হযরত উমর (রা.)-র নাম নিয়ে বলেছিল, **এরা কোথায়?** মহানবী (সা.) তখন সবাইকে উত্তর দিতে বারণ করেন। কারণ তখন উত্তর দিলে মুসলমানদের দুর্বল অবস্থার কারণে তারা বিপন্ন হতে পারত। তাই তিনি নীরব থাকার নির্দেশ দেন। এরপর আবু সুফিয়ান বলে, **হুবলের জয় হোক!** সে যখন এ কথা বলে তখন মহানবী (সা.) আর স্থির থাকতে পারেন নি এবং বলেন, **তোমরা এর উত্তর দাও!** সাহাবীগণ বলেন, আমরা কী উত্তর দেবো? তিনি বলেন, **বলো– আল্লাহ্ সর্বোচ্চ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ।** তখন আবু সুফিয়ান বলে, আমাদের উযযা আছে, আর তোমাদের জন্য কোনো উযযা নেই। তখন মহানবী (সা.) বলেন, এর উত্তর দাও। তারা (রা.) বলেন, আমরা কী বলব? তিনি (সা.) বলেন, **বলো– আল্লাহ্ আমাদের সাহায্যকারী, তোমাদের কোনো সাহায্যকারী নেই।** আল্লাহ্ তা'লার সত্তা ও তওহীদের বিষয়ে যখনই প্রশ্ন উঠেছে সে সময়ে তিনি (সা.) কোনো বিপদের পরোয়া করেন নি। সুতরাং সেসময় তওহীদের জন্য মহানবী (সা.)-এর আত্মভিমানের কারণেই তিনি (সা.) সাহাবীদের বলেন, **তোমরা বলো– اللهُ أعلى وأجلُّ، اللهُ أعلى وأجلُّ**– তুমি মিথ্যা বলছ! হুবল দেবতার মর্যাদা উচ্চ নয়। আল্লাহ্ এক-অদ্বিতীয়, তাঁর কোনো শরীক নাই; তিনি সম্মানিত, তাঁর মর্যাদা অতি উচ্চ।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর একটি উদ্ধৃতি আমি পড়ছি যা বার বার পড়ার ও শোনার মতো; যা তওহীদ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তাঁর (সা.) মর্যাদা সম্পর্কে আমাদের অবগত করে এবং আমাদের পথের দিশা দেয় যে, কীভাবে আমরা এর সঠিক জ্ঞান ও উপলব্ধি অর্জন করব। তিনি (আ.) বলেন:

আমি সর্বদা আশ্চর্যের দৃষ্টিতে দেখে থাকি, এই আরবী নবী যাঁর পবিত্র নাম মুহাম্মদ (সা.), হাজার হাজার দরূদ ও সালাম তাঁর ওপর বর্ষিত হোক, তিনি কত-না উচ্চ মর্যাদার অধিকারী নবী! তাঁর সুউচ্চ মর্যাদার চূড়ান্ত মার্গ উদ্‌ঘাটন করা সম্ভব নয় এবং তাঁর পবিত্র প্রভাবের ধারণা করা মানুষের জন্য সাধ্যাতীত। পরিতাপের বিষয় হলো, যেভাবে তাঁকে (সা.) শনাক্ত করার প্রয়োজন ছিল সেভাবে তাঁর (সা.) মর্যাদাকে শনাক্ত করা হয় নি। সেই তওহীদ যা পৃথিবী থেকে হারিয়ে গিয়েছিল– তিনিই একমাত্র সেই বীরপুরুষ যিনি পুনরায় তা পৃথিবীতে ফিরিয়ে এনেছেন। তিনি (সা.) খোদাকে ভীষণ ভালোবেসেছেন এবং মানবজাতির প্রতি ভালোবাসা ও সহমর্মিতায় তাঁর হৃদয় যারপরনাই বিগলিত হয়। এজন্য আল্লাহ্ তা'লা– যিনি তাঁর (সা.) অন্তরের গোপন রহস্য জানতেন– তিনি তাঁকে (সা.) সকল নবী এবং পূর্বাপর সকলের ওপরে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন এবং তাঁর (সা.) সকল উদ্দেশ্য ও সকল আকাঙ্ক্ষা তাঁর (সা.) জীবদ্দশাতেই পূর্ণ করেছেন। *এ হলো তাঁর সৌন্দর্য যে, তিনি (সা.) আল্লাহ্ তা'লার সাথে ভালোবাসারও চূড়ান্ত শিখরে পৌঁছেছেন এবং সৃষ্টির প্রতি সহানুভূতিরও চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন, যেন তারা আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য লাভ করে, তওহীদের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয় এবং নিজেদের ইহকাল ও পরকালকে সুশোভিত করে। তিনি (আ.) বলেন,* তিনিই প্রত্যেক কল্যাণের উৎস। আর যে ব্যক্তি তাঁর আধ্যাত্মিক কল্যাণের কথা স্বীকার না করে কোনো ধরনের শ্রেষ্ঠত্বের দাবি করে, সে মানুষ নয় বরং শয়তানের বংশধর। কেননা সকল কল্যাণের চাবি তাঁকে (সা.) দেওয়া হয়েছে এবং সব

ধরনের তত্ত্বজ্ঞানের ভাণ্ডার তাঁকে দেওয়া হয়েছে। যে ব্যক্তি তাঁর মাধ্যমে পায় না, সে চিরবঞ্চিত। আমরা কী এবং আমাদের গুরুত্বই বা কী? আমরা অকৃতজ্ঞ হবো যদি আমরা এ কথা স্বীকার না করি যে, প্রকৃত তওহীদ আমরা এই নবীর মাধ্যমেই পেয়েছি এবং জীবন্ত খোদার পরিচয় আমরা এই পূর্ণাঙ্গ নবীর মাধ্যমেই এবং তাঁর জ্যোতির মাধ্যমেই লাভ করেছি। আল্লাহ্ তা'লার সাথে বাক্যালাপ ও কথোপকথনের সম্মান– যার মাধ্যমে আমরা তাঁর চেহারা দেখতে পাই– তা-ও এই মহান নবীর মাধ্যমেই আমাদের হস্তগত হয়েছে। হিদায়াতের এই সূর্যের কিরণ রোদের মতো আমাদের ওপর পড়ে এবং আমরা কেবল ততক্ষণই আলোকিত থাকতে পারি, যতক্ষণ আমরা তাঁর (সা.) সামনে দাঁড়িয়ে থাকি।

অতএব আল্লাহ্ তা'লা পর্যন্ত পৌঁছানোর জন্য এবং প্রকৃত তওহীদকে জানার জন্য বর্তমানে তিনিই (সা.) হলেন মাধ্যম। যে-সব লোক এই ভ্রান্ত ধারণার ওপর অটল রয়েছে যে, মহানবী (সা.)-এর ওপর যে ব্যক্তি ঈমান আনে না অথবা মুরতাদ হয়ে যায়, কিন্তু তওহীদের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে এবং খোদাকে এক ও অদ্বিতীয় বলে মানে– সে-ও নাজাত (পরিত্রাণ) পাবে এবং ঈমান না আনার বা মুরতাদ হবার কারণে তার কোনো ক্ষতি হবে না– এমন লোকেরা প্রকৃতপক্ষে তওহীদের আসল মর্ম সম্পর্কেই অজ্ঞ। কেবল এক-অদ্বিতীয় মনে করলেই নাজাত লাভ হয় না, বরং নাজাত তো দুটি বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল। প্রথমত, পরিপূর্ণ বিশ্বাসের সাথে খোদা তা'লার অস্তিত্ব ও তাঁর একত্ববাদের ওপর ঈমান আনবে; (তিনি বলেন,) দ্বিতীয়ত, মহামহিমান্বিত অদ্বিতীয় খোদার এমন পূর্ণাঙ্গ ভালোবাসা তার অন্তরে প্রোথিত থাকা বাঞ্ছনীয়, যার আধিপত্য ও প্রাবল্যের ফলস্বরূপ খোদা তা'লার আনুগত্য তার প্রাণের একান্ত প্রশান্তি হয়ে দাঁড়াবে, যা ছাড়া সে বাঁচতেই পারবে না এবং তাঁর ভালোবাসা অন্য সকল বস্তুর ভালোবাসাকে পদদলিত ও নিশ্চিহ্ন করে দেবে। এটিই হলো প্রকৃত তওহীদ, যা আমাদের নেতা ও মনিব হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর অনুসরণ ব্যতীত অর্জিত হতেই পারে না।

কেন অর্জন করা সম্ভব নয়? এর উত্তর হলো, আল্লাহ্‌র সত্তা 'গাইবুল গাইব' (অদৃশ্যেরও অদৃশ্য), 'ওয়ারাউল ওয়ারা' (মহাপর্দার অন্তরালে) এবং অত্যন্ত গোপন এক সত্তা, যাকে মানুষের বুদ্ধি কেবল নিজের শক্তিবলে খুঁজে পেতে পারে না এবং কোনো বুদ্ধিবৃত্তিক প্রমাণ তাঁর অস্তিত্বের অকাট্য দলিল হতে পারে না। কারণ বুদ্ধির দৌড় ও চেষ্টা কেবল এতটুকু যে, এ জগতের সৃষ্টি পর্যবেক্ষণ করে একজন স্রষ্টার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। কিন্তু প্রয়োজনীয়তা অনুভব করা এক বিষয়, আর 'আইনুল ইয়াকীন' বা চাক্ষুষ বিশ্বাসের এই স্তরে পৌঁছানো যে, যেই খোদার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করা হয়েছে তিনি বাস্তবে বিদ্যমান আছেন– তা ভিন্ন বিষয়।

কেবল এ কথা বলাই যথেষ্ট নয় যে, কোনো একজন স্রষ্টা থাকা উচিত; বরং তিনি কে এবং তিনি যে জীবন্ত খোদা– এটি যদি জানতে হয়, তবে এই জ্ঞান মহানবী (সা.)-এর সাথে যুক্ত হবার মাধ্যমেই লাভ হবে। তিনি আরও বলেন, আর যেহেতু বুদ্ধিবৃত্তির পথ ত্রুটিপূর্ণ, অসম্পূর্ণ ও সন্দেহযুক্ত, তাই কোনো দার্শনিক কেবল যুক্তির মাধ্যমে খোদাকে চিনতে পারে না। বরং অধিকাংশ মানুষ যারা কেবল বুদ্ধির জোরে আল্লাহ্ তা'লাকে পেতে চায়, তারা শেষ পর্যন্ত নাস্তিক হয়ে যায়। আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি নিয়ে চিন্তা করা তাদের কোনো উপকারে আসে না। *বর্তমানে আমরা এমনটাই দেখতে পাচ্ছি। মুসলমানদের মধ্যে অনেক শিক্ষিত মানুষ নাস্তিক হয়ে যাচ্ছে; তারা খোদার অস্তিত্ব অস্বীকার করছে, কারণ*

তারা বুঝতেই পারছে না। তারা মহানবী (সা.)-এর সাথে যুক্ত হয়ে তাঁর প্রদত্ত শিক্ষা নিয়ে প্রণিধান করে নি। তিনি বলেন, তারা আল্লাহ্ তা'লার কামিল বান্দাদের নিয়ে বিদ্রুপ ও উপহাস করে। তাদের যুক্তি হলো, পৃথিবীতে এমন হাজারো বস্তু বিদ্যমান যেগুলোর অস্তিত্বের কোনো উপকারিতা আমরা দেখি না এবং আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিক গবেষণায় এমন কোনো শিল্প বা সৃষ্টি সামনে আসে না যা কোনো স্রষ্টার অস্তিত্ব প্রমাণ করবে; বরং কিছু জিনিসের অস্তিত্ব অসার ও অনর্থক বলে মনে হয়। পরিতাপ! সেই নির্বোধরা জানে না। *তারা যুক্তি উপস্থাপন করে যে, কোনো স্রষ্টা নেই, সব বস্তুর উপকারী দিক নেই। আসলে তারা জানেই না যে, উপকারী দিক আছে নাকি নেই। জ্ঞান না থাকার কারণে তারা এমন কথা বলছে।* তিনি বলছেন, পরিতাপ! সেই নির্বোধরা জানেই না, জ্ঞান না থাকা মানে এটি নয় যে, সেই বস্তুর অস্তিত্বই নেই। *কোনো বিষয় সম্পর্কে আপনার জ্ঞান না থাকার অর্থ এই নয় যে, সেই জিনিসের অস্তিত্ব নেই।* এই যুগে এমন লক্ষ লক্ষ মানুষ আছে যারা নিজেদেরকে প্রথম শ্রেণির বুদ্ধিমান ও দার্শনিক মনে করে এবং আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্বকে ঘৃণ্যভাবে অস্বীকার করে। এখন এটি স্পষ্ট যে, যদি কোনো শক্তিশালী বুদ্ধিবৃত্তিক যুক্তি তারা পেত, তবে তারা খোদার অস্তিত্ব অস্বীকার করত না। যদি মহিমান্বিত স্রষ্টার অস্তিত্ব সম্পর্কে কোনো বুদ্ধিবৃত্তিক অকাট্য প্রমাণ তাদেরকে অভিযুক্ত সাব্যস্ত করত *অর্থাৎ নিরুত্তর করে দিত*, তবে তারা চরম নির্লজ্জতা ও বিদ্রুপের সাথে খোদার অস্তিত্বকে অস্বীকার করত না। সুতরাং কোনো ব্যক্তি দার্শনিকদের নৌকায় চড়ে সংশয়ের তুফান থেকে মুক্তি পেতে পারে না, বরং সে নিশ্চিতভাবে ডুবে মরবে আর কখনোই সে খাঁটি তওহীদের সুধা পান করতে পারবে না। এখন চিন্তা করো, এই ধারণা কতটা অসার ও দুর্গন্ধময় যে, মহানবী (সা.)-এর মাধ্যম ছাড়া তওহীদ পাওয়া সম্ভব এবং এর মাধ্যমে মানুষ মুক্তি পেতে পারে! হে নির্বোধরা! যতক্ষণ খোদার সত্তার ওপর পূর্ণ বিশ্বাস না জন্মাবে, ততক্ষণ তাঁর তওহীদে বিশ্বাস আসবে কীভাবে? তাই নিশ্চিতভাবে জেনে রেখো, সুনিশ্চিত তওহীদ কেবল নবীর মাধ্যমেই পাওয়া যেতে পারে; যেমনটা আমাদের নবী (সা.) আরবের নাস্তিক ও ধর্মহীনদের হাজারো ঐশী নিদর্শন দেখিয়ে আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্ব স্বীকার করতে বাধ্য করেছিলেন। বর্তমানেও যারা মহানবী (সা.)-এর সত্য ও পূর্ণ আনুগত্য করে, তারা নাস্তিকদের সামনে সেই নিদর্শনগুলো উপস্থাপন করে। এখনও আমরা নিদর্শন প্রদর্শন করে থাকি। সত্য কথা এটাই যে, যতক্ষণ মানুষ জীবন্ত খোদার জীবন্ত শক্তিসমূহ পর্যবেক্ষণ না করে, ততক্ষণ শয়তান তার অন্তর থেকে বের হয় না, খাঁটি তওহীদ তার হৃদয়ে প্রবেশ করে না এবং সে নিশ্চিতভাবে খোদার অস্তিত্বে বিশ্বাসী হতে পারে না। আর এই পবিত্র ও পূর্ণাঙ্গ তওহীদ কেবল মহানবী (সা.)-এর মাধ্যমেই লাভ হওয়া সম্ভব।

সুতরাং, এটিই হলো প্রকৃত তওহীদ যা খোঁজার জন্য আমাদের চেষ্টা করা উচিত, অনুসন্ধান করা উচিত। আমাদের ঈমানকে এমন মানদণ্ডে পৌঁছানোর চেষ্টা করা উচিত, যেখানে আমরা যে-কোনো ত্যাগস্বীকারে প্রস্তুত থাকব। মহানবী (সা.)-এর প্রতিও নিজেদের অন্তরে প্রকৃত ভালোবাসা সৃষ্টি করতে হবে। এ যুগে আল্লাহ্ তা'লা মহানবী (সা.)-এর নিষ্ঠাবান দাসকে তওহীদ প্রতিষ্ঠার কাজ অব্যাহত রাখার জন্য পাঠিয়েছেন এবং আমরা এই উদ্দেশ্যেই তাঁর হাতে বয়আত গ্রহণ করেছি। আর এরপর হক আদায়ের নিমিত্তে আমাদের সর্বাত্মক চেষ্টা করা উচিত এবং এর জন্য দোয়াও করা উচিত। রমযানের বাকি দিনগুলোতে আমাদের বিশেষভাবে দোয়া করা উচিত, তওহীদ প্রতিষ্ঠা এবং এর জন্য আত্মাভিমান প্রদর্শনে আমরা যেন সবার চেয়ে এগিয়ে থাকি। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের

তৌফিক দিন, আমাদের দুর্বলতা দূর করুন। যেমনটি আমি গত জুমুআতেও বলেছিলাম, মুসলিম উম্মাহর জন্যও দোয়া করুন, তারাও যেন প্রকৃত তওহীদ বুঝতে সক্ষম হয় এবং এর ওপর আমলকারী হয়। তবেই তাদের অস্তিত্ব টিকে থাকবে, তবেই তারা শত্রুদের দাজ্জালী চক্রান্ত থেকে রেহাই পাবে। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরও এই তৌফিক দিন।

নামাযের পর আজও আমি একটি গায়েবানা জানাযা পড়াবো, যা মুরব্বী সিলসিলা মুকাররম যিকরুল্লাহ্ তায়ূ আইয়ূব সাহেবের। সম্প্রতি তিনি আশি বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন। তিনি আল্লাহ্ তা'লার ফযলে মূসী ছিলেন। তিনি নাইজেরিয়ার অধিবাসী। ১৯৬৫ সালে তিনি একটি স্বপ্নের ভিত্তিতে আহমদীয়াত গ্রহণ করেন। ১৯৬৬ সালে ঘানার মিশনারি ট্রেনিং কলেজে ভর্তি হন এবং সেখান থেকে প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন করার পর ১৯৬৯ সালে নাইজেরিয়ায় ফিরে আসেন। এক বছর দায়িত্ব পালনের পর ১৯৭০ সালে 'শাহেদ' ডিগ্রির জন্য জামেয়া আহমদীয়া রাবওয়াতে ভর্তি হন। ১৯৭৭ সালে তিনি 'মৌলভী ফাযেল' পরীক্ষাও পাস করেন। ১৯৭৯ সালে 'শাহেদ' ডিগ্রি অর্জন করেন, এরপর নাইজেরিয়ায় ফিরে আসেন এবং কাজ আরম্ভ করেন ও মৃত্যু পর্যন্ত সেখানেই ছিলেন। তিনি প্রায় ৪৭ বছর পর্যন্ত কাজ করার তৌফিক পান। নাইজেরিয়ার বিভিন্ন স্থানে তিনি কাজ করার সুযোগ পেয়েছিলেন। তিনি নাইজেরিয়ায় নায়েব আমীর হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। তিনি সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রিও অর্জন করেছিলেন। তাই এক্ষেত্রেও তিনি কাজ করে গেছেন। জামেয়াতুল মুবাশশিরীন নাইজেরিয়ার প্রিন্সিপাল হিসেবেও তার পদায়ন হয়েছিল। প্রথমে ভারপ্রাপ্ত প্রিন্সিপাল এবং পরে তিন-চার বছর স্থায়ী প্রিন্সিপাল ছিলেন। তিনি একজন চমৎকার খেলোয়াড়ও ছিলেন, খেলাধুলার প্রতি তার প্রবল আগ্রহ ছিল; কিন্তু তিনি কখনো খেলাধুলাকে নিজের ইবাদতের পথে বাধা হতে দেন নি। তিনি একজন ভালো লেখক, ভাষাবিদ এবং কবিও ছিলেন। রেখে যাওয়া স্বজনদের মধ্যে স্ত্রী ছাড়াও তিন ছেলে এবং পাঁচ মেয়ে রয়েছে। তার সবচেয়ে ছোটো ছেলে আব্দুল মুজীব সাহেব বর্তমানে নাইজেরিয়ায় জামা'তের মুবাল্লেগ হিসেবে দায়িত্বপালনের পাশাপাশি **রিভিউ অব রিলিজিয়ন্স নাইজেরিয়া**র কোঅর্ডিনেটর হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি ওয়াকেফে যিন্দেগী।

মিশনারি ইনচার্জ তাহের আদনান সাহেব বলেন, মরহুম অত্যন্ত ধর্মভীরু, অনুগত এবং জামা'তের সেবার জন্য সবসময় প্রস্তুত এক ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তিনি বলেন, আমি ২০ বছরেরও বেশি সময় ধরে তাঁকে কাছ থেকে দেখার সুযোগ পেয়েছি এবং এই সময়ে তাঁর উন্নত চরিত্র, বিনয়, নম্রতা এবং খিলাফত ও জামা'তের ব্যবস্থাপনার প্রতি অসাধারণ বিশ্বস্ততা ও আনুগত্যের বহু দৃষ্টান্ত প্রত্যক্ষ করেছি। তিনি বলেন, আমি যখন ইনচার্জ নিযুক্ত হই তখন তিনি বয়সে আমার চেয়ে বড়ো হওয়া সত্ত্বেও পূর্ণ বিশ্বস্ততা, দায়িত্বশীলতা এবং আনুগত্যের চেতনা নিয়ে আমার কথা মেনে নিয়েছেন এবং তার ওপর আমল করেছেন।

একইভাবে, মুরব্বী সিলসিলা ইউসুফ খালেক সাহেব বলেন, প্রিন্সিপাল হিসেবে তিনি ছাত্রদের তরবিয়তের দিকে অসাধারণ মনোযোগ দিতেন। তিনি ছাত্রদের মধ্যে দায়িত্ববোধ সৃষ্টি করেন এবং সবসময় এই উপদেশ দিতেন যে, কোনো কাজ করতে গিয়ে অজুহাত যেন উপস্থাপন করা না হয়। তিনি যুগ-খলীফার নির্দেশনার ওপর তাৎক্ষণিক আমল করার প্রতি বিশেষ জোর দিতেন। ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের জন্য তিনি ছাত্রদেরকে

তবলীগি অভিযানেও পাঠাতেন। প্রতিটি কাজের ক্ষেত্রে তিনি সবসময় নিজের ব্যক্তিগত দৃষ্টান্ত স্থাপন করতেন, যা ছাত্রদের জীবনে এক গভীর প্রভাব ফেলেছিল।

আমিও তাকে দেখেছি। তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠাবান, বিশ্বস্ত এবং অত্যন্ত বিনয়ী মানুষ ছিলেন। আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতি মাগফিরাত ও কৃপা করুন এবং তার মর্যাদা সমুন্নত করুন।

(কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)